গ্রামীণ নারীর ক্ষমতায়ন

মোঃ আতিকুর রহমান মুফতি

সালটা ছিল ২০২১। সদ্যবিধবা কানিজ সুবর্ণার বয়স তখন ২১ বছর মাত্র। দুই বছরের বিবাহিত জীবনের সব হিসেব যেন আকস্মিক বদলে যায় স্বামীর অকাল মৃত্যুতে। এরই মধ্যে ছেলের মা হয়েছেন তিনমাস হলো। বাবার বাড়ির সংসারে আর্থিক টানাপোড়েনে উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়া সুবর্ণাকে মাত্র ১৯ বছর বয়সেই বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। স্বামীর আর্থিক অবস্থাও তেমন ভালো ছিলনা, ফলে সেই সংকটের সংসারই বয়ে চলছিলেন তিনি। তাতেও যেন শেষ রক্ষা হলো না। স্বামীর মৃত্যুতে শুরু হলো একক নারী হিসেবে তাঁর তীব্র সংগ্রামের জীবন। তখন যশোরের মনিরামপুরে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে হস্তশিল্প বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন তিনি। কয়েক বছরের কঠিন জীবন সংগ্রাম শেষে এখন সুবর্ণার অধীনে প্রায় আটশত নারী কাজ করেন। আগে উৎপাদিত পণ্য বিভিন্ন দোকানের সরবরাহ করতেন। এখন তিনি নিজেই সরাসরি ক্রেতার কাছে পণ্য বিক্রি করতে জেলা শহরে দুইটি সুসজ্জিত আউটলেট খুলেছেন। উদ্যোক্তা হিসেবে চারিদিকে বেশ নামডাক হয়েছে তার। আগে আর্থিক ঋণ পেতে ব্যাংকের দ্বারে দ্বারে ঘুরতেন, এখন ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা তার সাথে দেখা করতে আসেন। সুবর্ণাকে জেলা নারী চেম্বার অব কমার্সেরও সদস্য করে নিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। সপ্তাহের অধিকাংশ সময়ই গ্রামে নারীকর্মীদের সাথেই কাটে তার । কোন কোন সময় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-মেম্বাররা এলাকার বিচার সালিশেও সুবর্ণাকে রাখার চেষ্টা করেন।

সুবর্ণার মতো বাগেরহাট শহরতলির মারিয়াপল্লির রুম্পা মাখালের নেতৃত্বে হস্তশিল্পের কাজ করে ৪৪ জন নারীর সংসারে সচ্ছলতা ফিরে এসেছে। কাশফুলের শুকনা খড়ি ও খেজুরগাছের পাতা দিয়ে তারা শুরু করেন হস্তশিল্পের কাজ। স্থানীয় নারীদের নিয়ে রুম্পার দল এখন তৈরি করছে ফলের ঝুড়ি, ফ্লোর কাভারিং ম্যাট, টেবিল ম্যাট, ডালাসহ ঘর সাজানোর বাহারি পরিবেশবান্ধব পণ্য। পণ্য এবং এর মানভেদে দাম পান ৫০ থেকে দুই হাজার টাকা পর্যন্ত। গত বছর রুম্পার নারীদল এ ধরনের পণ্য বিক্রি করে ৫০ লাখ টাকার বেশি আয় করেছেন।

কঠিন জীবনসংগ্রাম পার করে গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার এরকম ঘটনাগুলো এখন প্রতিনিয়তই সবার দৃষ্টি কাড়ছে। সমাজের প্রচলিত ধারণাকে অতিক্রম করে ঘরের চার দেয়ালের অচলায়তন ভেঙে বেরিয়ে আসছেন নারীরা। প্রয়োজনের তাগিদে পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নে যেমন অবদান রাখছেন তারা, তেমনি সামাজিক ও ক্ষেত্রবিশেষে রাজনীতিতেও প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন হরহামেশাই।

নারী ক্ষমতায়নের বিষয়টি মাথায় এলে গ্রামীণ নারীদের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সর্বাগ্রে বিবেচনার দাবি রাখে। পুরুষতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীর সরাসরি অংশগ্রহণ আমাদের সমাজব্যবস্থায় কখনোই সহজে গ্রহণযোগ্য ছিল না। স্বাভাবিকভাবে গৃহস্থলির কাজকর্ম এবং সন্তান লালন-পালন নিয়েই নারীরা ব্যস্ত থাকবেন বলে ধরে নেয়া হতো। তবে কৃষিভিত্তিক সমাজে কৃষিক্ষেত্রে নারীর অবদান থাকলেও তার স্বীকৃতি কোনো কালেই জোটেনি। স্বাধীনতার আগে পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশেষ ১৯৬১ সালের জরিপ অনুসারে, সরাসরি কৃষিতে অংশগ্রহণকারী নারীর সংখ্যা ছিল দুই হাজার ৪২৩ জন। ২০১৮ সালে প্রকাশিত শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, বাংলাদেশে কৃষিতে যুক্ত নারীর সংখ্যা এক কোটি ১১ লাখ। কৃষি তথ্য সার্ভিসের তথ্যনুযায়ী, দেশে মোট কর্মক্ষম নারীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যকই কৃষিকাজে নিয়োজিত। নারী শ্রমশক্তির ৭১ দশমিক ৫ শতাংশ কৃষিকাজে যুক্ত রয়েছে। গবাদিপশু পালন এবং দুধ ও ডিম উৎপাদনে নারীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারও গ্রামীণ নারীদের খামার স্থাপনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিয়ে আসছে। নারীরা কৃষিকাজে জড়িত কাজের ২১টি ধাপের মধ্যে ১৭টি ধাপেই কাজ করে থাকেন। ফসলের প্রাক-বপন প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে ফসল উত্তোলন, বীজ সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং বিপণনের সঙ্গে ৬৮ শতাংশ নারী সম্পৃক্ত। বর্তমানে কৃষিখাতে নিয়োজিত আছেন ৯০ লাখের বেশি নারী। গত এক দশকে কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণও বেড়েছে ১০৮ শতাংশ। কিন্তু কৃষিখাতে পণ্য উৎপাদনে গ্রামীণ নারীরা যে ভূমিকা রাখতেন তা এতকাল জিডিপির হিসেবে ধরা হয়নি। তবে সময়ের পরিবর্তনের সাথে নারীদের এ অবদান নীতিগতভাবে স্বীকার করার সময় এসেছে। সময় এসেছে এখাতে তাদের ক্ষমতায়নকে মেনে নেওয়ার, কারণ নারীরা না থাকলে কৃষিখাত অচলই বলা চলে।

আবার, গ্রামীণ অর্থনীতিতেও নেতৃত্ব দিচ্ছেন এই নারীরাই। নারীর অবদান যেখানে ৫৩ শতাংশ, এর বিপরীতে পুরুষের ৪৭ শতাংশ। নানাবিধ কাজের মধ্যে গ্রামীণ নারীরা হাতের বিভিন্ন কাজ যেমন-নকশিকাঁথা, বাঁশ ও বেতের কাজ ছাড়াও নানা হস্তশিল্প, হাঁস-মুরগির খামার, গাভী পালন, পাখি ও কবুতরের খামার, কৃষিকাজের মাধ্যমে সংসারে আর্থিক সহায়তা করছেন। আবার কোনো কোনো সংসারে আয়ের ক্ষেত্রে নারীরাই প্রধান ভূমিকা রাখছেন। দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে একজন নারী শুধু নিজের কর্মসংস্থান বা চাকরি নয়, বরং নিজে উদ্যোক্তা হয়ে অন্যের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারছেন। এসবের ফলে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন যেমন

হয়েছে, তেমনি সামগ্রিক অর্থে নারীর গুরুত্বও সমাজে-সংসারে বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতাও বেড়েছে, একইসাথে বেড়েছে তার গুরুত্ব।

অন্যদিকে, রাজনীতিতে গ্রামীণ নারীর অংশগ্রহণ একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় বলে ধরা হয়। দেশের জন্য যেকোনো নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান থেকে সঠিক পরামর্শ ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। সকল কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে রাজনীতির জগতে নারীরা তাদের অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। এটি যেমন জাতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে সম্ভব হয়েছে তেমনি স্থানীয় রাজনীতিতেও নারীর ভূমিকা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সাংবিধানিক স্বীকৃতি ও আইনি সুযোগ থাকলেও বাংলাদেশের স্থানীয় সরকার নীতি ও ব্যবস্থায় নারীর ভূমিকা ও অংশগ্রহণ দীর্ঘদিন অবহেলিত ছিল। ইউনিয়ন পরিষদ ও পৌরসভা হলো স্থানীয় শাসনের ক্ষেত্রে শত বছরেরও পুরনো প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এগুলোয় নারীদের আনুষ্ঠানিক অংশগ্রহণ শুরু হয়েছে খুবই সম্প্রতি। গ্রামীণ এলাকায় স্থানীয় সরকারস কাঠামো তথা ইউনিয়ন পরিষদ ও শহরাঞ্চলে পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশন উভয় ক্ষেত্রেই গত দশকের শেষভাগে নারীরা কোটা পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ন্যূনতম অংশগ্রহণের সুযোগ লাভ করে। ১৯৭৬ সালের ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ ও ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশে স্থানীয় সরকার কাঠামোতে নারীর অংশগ্রহণ শুরু হয়। এ সময় প্রথমবারের মতো প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে দুইজন নারী মনোনয়ন পেতেন মহকুমা প্রশাসকের মাধ্যমে। ১৯৮৩ সালের ইউনিয়ন পরিষদ অধ্যাদেশ অনুযায়ী মনোনীত নারী প্রতিনিধির সংখ্যা দুই থেকে বাড়িয়ে তিনজন করা হয়। ১৯৯৩ সালে স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ ১৯৮৩ সংশোধন করে মনোনীত তিনজন নারী সদস্যকে মনোনয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত পুরুষ সদস্য ও চেয়ারম্যানের ওপর। ১৯৯৭ সালের সংশোধিত অধ্যাদেশের ধারা ৫-এর মাধ্যমে এখন ইউনিয়ন পরিষদে তিনটি সংরক্ষিত আসনে নারী সদস্যরা প্রতি তিন ওয়ার্ডে একজন করে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হচ্ছেন। ফলে প্রথম নির্বাচনে চার হাজার ২৭৬টি ইউনিয়ন পরিষদের ১২ হাজার ৮২৮টি সংরক্ষিত আসনে ৪৫ হাজার নারী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হন। সময়ের সাথে নারীরা কেবল সংরক্ষিত আসনে নয় বরং পুরুষের সাথে স্বাভাবিকভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হচ্ছেন। যা রাজনীতির ক্ষেত্রে গ্রামীণ নারীদের ক্ষমতায়নের একটি নমুনা বলে ধরে নেয়া যেতে পারে।

আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে, নারীর ক্ষমতায়নের পথে নানা ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতা বিদ্যমান। অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত কুসংস্কার ও রক্ষণশীল মানসিকতার কারণে নারীদের স্বাধীনভাবে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে। শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য এবং বাল্যবিবাহ নারীদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনার বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। একই সাথে পারিবারিক ও সামাজিক চাপ, কর্মসংস্থানের সীমিত সুযোগ এবং সমান কাজের জন্য সমান মজুরি না পাওয়াও নারীদের অগ্রগতির পথে বড়ো অন্তরায়। নারীর প্রতি সহিংসতা ও নিরাপত্তাহীনতা তাদের আত্মবিশ্বাস ও স্বাধীনভাবে কাজ করার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। তাছাড়া নিজেদের আইনগত অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা, রাজনৈতিক ও নেতৃত্বের ক্ষেত্রে কম অংশগ্রহণ এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে পিছিয়ে থাকাও গ্রামীন নারীদের ক্ষমতায়নের পথে উল্লেখযোগ্য অন্তরায় বলে মনে করা হয়। তাই এসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে নারীদের জন্য সমান সুযোগ ও সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি।

সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্রান্তিকালে এদেশের নারীরা সবসময়ই সবার আগে এগিয়ে এসেছেন। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার যেমন প্রতিরোধের প্রতীকে পরিণত হয়েছেন, তেমনি ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনেও ১৪৪ ধারা ভেঙে প্রথম রাজপথে নামেন নারীরাই। মহান মুক্তিযুদ্ধেও ক্যাপ্টেন সিতারা বেগম, তারামন বিবি কিংবা কাঁকাকন বিবিদের ত্যাগে ও সাহসিকতায় আমরা পেয়েছি স্বাধীনতা। নিকট অতীতে ময়মনসিংহের প্রত্যন্ত গ্রাম কালসিন্ধুর ধোবাউড়ার মেয়েরা ফুটবলের যাদুতে জাতীয় ও আন্তর্জাতি অঙ্গনে নিজেদের তুলে ধরেছে অনন্য উচ্চতায়।

আমাদের গ্রামীণ নারীরা যেমন মাতৃস্নেহ পরায়ন, তেমনি প্রয়োজনে ইস্পাত কঠিন মনোবলের অধিকারী। একটু সুযোগ পেলেই পরিবার ও সমাজের জন্য উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে তারা পিছপা হন না। তাই দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে গ্রামীন নারীদের উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসার বিকল্প নেই। এরই মাধ্যমে নারীদের প্রকৃত ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে, গড়ে উঠবে ভারসাম্যের সমাজ। আর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে গ্রামীণ ও শহুরে নারীদের মধ্যকার বৈষম্যও ঘুচবে অনেকটাই। ক্ষমতায়নের পথে গ্রামীণ নারীরা আরও এক ধাপ এগিয়ে যাবেন।

#

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার